২৩-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এই হতাশার দুনিয়ায় কেবলই ব্যর্থতা আর নিরাশা। এই দুনিয়ার সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। তাই এর থেকে থেকেই মমত্ব সরিয়ে নিয়ে, একমাত্র আমাকেই (শিবকেই) স্মরণ করো।"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় সেবায় উৎসাহ-উদ্দীপনা না আসার কারণগুলি কি কি ?

উত্তর :- (১) যদি তার ভাব-গতি(চরিত্র) ঠিক-ঠাক না থাকে, বাবাকে সেভাবে স্মরণ না করে- তবে তার ঈশ্বরীয় সেবায় সেই উদ্যম-উৎসাহ আসে না। তার দ্বারা কোনও না কোনও অকাজ-কুকাজ হতেই থাকে, ফলে তার দ্বারা আর সেবাকার্য হয়ে ওঠে না। (২) বাবার প্রথম নির্দেশই হল - 'আমি মরলে এই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত'-- এই কথাটাকে একেবারেই আমল দেয় না। দেহ বা দেহের সম্বন্ধের প্রতিই মন-বুদ্ধিতে আটকে থাকে বলে ঈশ্বরীয় সেবা করতে পারে না।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ .....।

ওঁম্ শান্তি! ভক্তি-মার্গের এই গীত তো তোমরা শুনলে। বলা হচ্ছে - শিবায়ঃ নমঃ, শিবকে নমস্কার। মূহুর্তে মূহুর্তেই (আত্মারা) শিবের নাম উচ্চারণ করে। রোজ শিবের মন্দিরে যায় আর প্রতি বছরই তার উৎসবও করা হয়। পুরুষোত্তম্ মাস যেমন আছে, তেমনি পুরুষোত্তম্ বর্ষও হয়। আর শিবায়ঃ নমঃ তো রোজই বলা হয়ে থাকে। যেহেতু সমগ্র জগতে শিবের পুজারীর সংখ্যাও অনেক। শিব সব কিছুরই রচয়িতা-যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের সর্ব্বোচ্চ --'ভগবান'। তাই তো ওঁনাকে বলা হয় পতিত-পাবন, পরম-পিতা, পরমাত্মা-শিব। রোজই যাঁর এত পূজা-অর্চনা করা হয়। বাচ্চারা তোমরা তো জানো, বর্তমান সময়টা সঙ্গমযুগ-পুরুষোত্তম্ হওয়ার সময় এটা। জাগতিক পড়াশুনা করে কেউ কেউ অনেক উঁচু পদের অধিকারী হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারীর মালিক হলেন - তা কারও জানা নেই। রোজই শিবকে নমস্কার জানাও, --তুমিই আমাদের মাতা-পিতা বলে কতই না গুন-মহিমার কীর্তণ করতে থাকো রোজ। কিন্তু এটাই কারও জানা নেই যে, উনি কখন এসে মাতা-পিতার মতন ওঁনার আশীর্ব্বাদী-বর্সা দেন। যদিও তোমরা তা জানো, কিন্তু জাগতিক দুনিয়ার মানুষ এ সবের কিছুই জানে না। তাই তো তারা ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতিতে এদিক-ওদিক কেবল ঠোকর খেতেই থাকে। লোকে অমরনাথের উদ্দেশ্যে দলে-দলে যেতে থাকে। কত ধাক্কা-ধাক্কি খেতে হয়। তাদেরকে তা বললে আবার ক্ষেপেও যাবে। তোমরা অনেক সংখ্যায় না হলেও তোমাদের অন্তরে সর্বদাই খুশীর জোয়ার বয়। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমনও লিখে জানাও, বাবা যখন থেকে তোমাকে জানতে পেরেছি, ব্যস্ তখন থেকে তো আমার খুশীর সীমা নেই । কোন প্রকারের অসুবিধা হলেও, তবুও খুশী কিন্তু অটুট থাকে। আমি যখন বাবাকে একবার আপন করেছি, তখন আর বাবাকে ভুললে চলবে না কিন্তু। বাচ্চারা তোমরা তো বলোই, আমরা শিববাবাকে পেয়েছি। তাই তো আমাদের খুশীর অন্ত নাই। মায়া প্রতি পদে পদেই তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। যদিও কেউ কেউ নিশ্চয়তার সাথে লিখে জানাও, আমি

বাবাকে জানি, তবুও তোমাদের পুরুষার্থের এগিয়ে যাওয়ার পথে চলতে গিয়ে তাতে নিরুৎসাহ (ঠান্ডা) হয়ে পড়তে হয়। কেউ ছয় থেকে আট মাস, কারও দুই-তিন বছর হলেও, বাবা তা বুঝে যান সে নিশ্চয়-বুদ্ধির হয়নি। পুরোপুরি নেশা এখনও আসেনি। যেহেতু ইনি অসীম-বেহদের বাবা, তাঁর কাছ থেকেই ২১ জন্মের জন্য আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। এটার নিশ্চয়তা এলেই কত খুশী আর আসক্তি আসা উচিত। যেমন কারও কোনও বাচ্চা যদি জানতে পারে যে, রাজা আমাকে তার পোষ্য নেবে, এমনই কথাবার্তা চলছে - তখন সেই বাচ্চা কতই না খুশীতে থাকবে। সেই বাচ্চা তখন ভাবতে থাকবে, আমি হবো রাজার সন্তান । অথবা কোনও গরীবের বাচ্চাকে ধনী ব্যাবসায়ী পোষ্য নিলে, সেও কত খুশীতে থাকে। তখন সে পরিচিতি পায়, অমুকে তাকে পোষ্য নিলো। সাথে তার গরীব অবস্থার দুঃখও মোচন হল। কিন্তু এসব তো হয় কেবল এক জন্মের জন্য। আর এখানে তো বাবার বাচ্চাদের -২১ জন্মের জন্য খুশীর আশীর্ব্বাদী-বর্সার প্রাপ্তি ঘটে। তার জন্য শুধু অসীম-বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে হয় আর অন্যদেরকেও সেই দিশা দেখাতে হয়। সবাইকেই একথা জানানো উচিত, শিববাবা যিনি পতিত-পাবন বাবা, তিনি স্বয়ং অবতরণ করেছেন এই ধরাধামে। উনি নিজেই তা বলছেন, "আমিই (পরমাত্মা) তোমাদের (আত্মাদের) বাবা!"-- এভাবে কোনও মনুষ্যই জোরের সাথে বলতে পারে না যে, "আমিই তোমাদের বেহদের বাবা।" বাবা নিজেই তা জানাচ্ছেন যে, আগেও ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে উনি এসেছিলেন। তোমাদেরকে ঠিক একই কথা বলেছিলেন, "মামেকম্(একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো" । আমাকে অর্থাৎ পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করলেই, তোমাদেরও এই পতিত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে পবিত্র পাবন হতে পারবে। এছাড়া অন্য কোনও উপায় আর নেই যে, পতিত থেকে পাবন অবস্থায় আসার। পতিত পাবন একজনই, তিনি হলেন বাবা। কৃষ্ণকে কিন্তু ভগবান বলা যায় না। গীতার ভগবান তো একজন-ই, যিনি পতিত পাবন, যার পুনর্জন্ম হয় না। তোমরা যাদেরকে বাবার কথা শোনাবে, তাদেরকে প্রথমে গীতার এই কথাটাই লেখাবে। জ্ঞানী-গুণীদের সেই লেখা দেখলে, অন্যেরা তা সঠিক মনে করবে। কিন্তু কোনো সাধারণ মানুষের লেখা দেখলে ভাববে, ব্রহ্মা-কুমারীরা এমনই জাদু করেছে, যার ফলে তারা এমনটাই লিখে দিয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী-গুনীদের ক্ষেত্রে তা বলবে না অবশ্যই। তোমরা যাই বলো না কেন- তারা বলবে, ছোট মুখে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। আবার বলে কি, ভগবান এসেছেন এই ধরায়। তারা এ সবের অর্থ তো বুঝবেই না, উল্টে ঠাট্টা-তামাসা করবে। কিন্তু তাদেরকে তো দুই বাবার বিষয়টা বোঝাতেই হবে। ফট্ করে প্রথমেই সোজাসুজি তা বোঝাতে যাবে না যে, ভগবান ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আজকাল তো দুনিয়াতে অনেকেই নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করে। তারা সব এক একজন নিজেকে ভগবানের অবতার মনে করে, তাই যুক্তি সহযোগে দুই বাবার রহস্য বোঝাতে হবে। একজন হলো এই হদের স্থুল-পার্থিব দুনিয়ার লৌকিক বাবা, দ্বিতীয়-জন বেহদ অসীমের পার-লৌকিক বাবা। যেই বাবার নাম -'শিব'। যিনি দুনিয়ার সব আত্মাদের বাবা -- 'পরমাত্মা'। তাই তো উনি ধরায় অবতীর্ণ হন ওনার বাচ্চাদেরকে আশীর্ব্বাদী বর্সা দেবার লক্ষ্যে। তাই তো বাচ্চারাও শিববাবার জয়ন্তী উৎসব পালন করে। উনি এসে স্বর্গ স্থাপনার কার্য শুরু করেন। সেক্ষেত্রে তো বর্তমানের এই নরকের বিনাশ অবশ্যই হতে হবে। তারই উদাহরণ স্বরূপ মহাভারতের যুদ্ধ। কেবল এই কথা বললে কেউ বুঝতেই পারবে না-- ভগবান স্বয়ং ধরায় উপস্থিত। তারা তো খালি ঢাক-ঢোলই পিটতে থাকে। এ ধরণের উল্টো সেবা করলে, সেই সেবাতে আরও ঢিলেমী চলে আসে। একদিকে প্রচার করে, ভগবান এসেছেন, উনি স্বয়ং আমাদের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন- আবার অন্যদিকে বাইরে গিয়ে বিয়ে-শাদী করে বসে। তখন অন্য লোকেরা তো বলবেই, তোমাদেরই এই অবস্থা। যেখানে তোমরাই জানিয়েছিলে, স্বয়ং ভগবান তোমাদের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ান। উত্তরে তোমাদের কেউ কেউ এমনও

জানাও, --আমরা যা শুনেছিলাম, সেটাই বলেছি। এরকম অনেক প্রকারের বিঘ্নই আসে, যা আবার নিজের বচ্চাদের থেকেই। যেমন হিন্দু-ধর্মাবলম্বীরা নিজেরাই নিজেদের ধর্মের ক্ষতি সাধন করেছে। বাস্তবে যা দেবী-দেবতা ধর্ম, কিন্তু তারা তাকেই হিন্দু-ধর্ম বলে প্রচার করে। এ ভাবেই নিজেদের ক্ষতি তো নিজেরাই করলো। এখন তো তোমরা বুঝতে পারছো, তোমরাই একদা পূজ্য ছিলে, যখন তোমাদের কর্ম ছিল শ্রেষ্ট, ধর্মও ছিল শ্রেষ্ট। কিন্তু বর্তমানের এই আসুরী মতের জন্যই ধর্মও হয়েছে ভ্রষ্ট, আর কর্মও হয়েছে ভ্রষ্ট। ফলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ধর্মকে এইভাবে দুর্বল করতে শুরু করেছি, আসুরী মায়ার (মত) নিয়মকে আঁকড়ে ধরে। এই কারণেই বাবা জানান যে, "ওরা হলো অসুরের সম্প্রদায়- আর আমরা হলাম দৈবী সম্প্রদায়। আমি নিজে যাদেরকে রাজযোগ শেখাই।"-- বর্তমান সময় কলি-যুগে যে এসে এই জ্ঞানের পাঠ নেয়, সে অসুর সংস্কার মুক্ত হয়ে দেবতা স্বভাবের হয়ে যায়। যেহেতু দৈবী জ্ঞান ধারণেই দেবতা হওয়া যায়। ৫-বিকারকে বশে রাখতে পারলেই, দেবতার গুণে গুনী হওয়া যায়। এছাড়া অসুর আর দেবতার যুদ্ধ, সে তো বাস্তবিক কোনও যুদ্ধ নয়। যাকে ভুল-ভাল ভাবে প্রকাশ করা হয়। যার পক্ষে স্বয়ং ভগবান, তারই জয় হয়। সেখানে আবার কৃষ্ণের নাম বলা আছে। বাস্তবিক যুদ্ধ তো তোমাদের, --মায়ার সাথে। বাবা বসে বসে তো কত কথাই এভাবে বোঝাতে থাকেন, কিন্তু একেবারেই তমোপ্রধান হওয়ার কারণে সেগুলোকে সেইভাবে বুঝতেই পারো না। বাবাকেও সেভাবে স্মরণ করতে পারো না। তোমাদের নিজেদেরও তা উপলব্ধিও হয়, নিজেদের তমোপ্রধান বুদ্ধির জন্যই স্মরণের যোগ ঠিকমতন লাগে না। ফলে উল্টো-পাল্টা কাজও করতে থাকো তোমরা। অনেক ভাল ভাল বাচ্চারাও স্মরণটাকে ঠিকভাবে করতে পারে না। তাদের স্বভাব-সংস্কারগুলিকেও পল্টাতে পারে না, ফলে সেবাতে উদ্যম-উদ্দীপনাও আসতে পারে না। তাই তো বাবা বলেন, দেহ সহিত দেহের যে সম্বন্ধগুলি আছে, সেগুলিকে মেরে ফেলো অথবা ভুলে যাও। মারো শব্দের প্রকৃত সেই অর্থে মেরে ফেলা নয় - অর্থাৎ নিজের পুরোনো দুনিয়ার তমোপ্রধান সংস্কার-গুলিকে ঝেড়ে ফেললেই, পুরোনো সেই সংস্কারগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সেগুলিই বাবা বসে বোঝাতে থাকেন। বুদ্ধির পুরোনো সংস্কার-গুলিকে একেবারেই ভুলে যেতে হবে। যখন তোমরা পবিত্র বাবার বাচ্চা হয়েছো, তখন তো সেগুলিকে ভুলতেই হবে। একমাত্র বাবার স্মরনেই থাকতে হবে। যখন কোনও রুগীর বাঁচার আশা একেবারেই ত্যাগ করে, তার প্রতি আর মমত্ব না রেখে, তার অন্তিম যাত্রার প্রস্তুতিতে তাকে রামনাম (হরিবোল) ধ্বনি শোনানো হয়, বর্তমানের এই জাগতিক দুনিয়ারও অবস্থাও অনেকটা সেই প্রকারের- এই কথাটাই বাবা বোঝাতে চাইছেন। যেহেতু এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হলো বলে। তখন তো সবাইকেই মরতে হবে। অতএব এখনই তার থেকে মমত্ব দূর করো। কোনও মানুষ মরলে তো লোকেরা রামনাম ধ্বনি দিতে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে তো আর এক-দুজনের ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়াটারই যে বিনাশ হবে, তাই তোমাদের জন্য কেবল একটাই মন্ত্র 'মামেকম্ য়াঁদ করো'- অর্থাৎ আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। কত ভাবেই তো তা বোঝানো হচ্ছে। কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তা জানানোও হচ্ছে। যেমন পুরুষোত্তম্ মাস আসে, তেমনি পুরুষোত্তম্ যুগও আসে- তাও তো বোঝানো হয়েছে তোমাদের। এ সব বোঝাতে গেলেও তো দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যথেষ্ট ধারণারও প্রয়োজন লাগে এতে। আর তা ধারণ করতে গেলে কোনও পাপ কর্ম করা চলবে না। না জানিয়ে কোনও কিছু নেওয়া, খারাপ কিছু খাওয়া -এ সব তো গুপ্ত পাপ। আদব-কায়দা খুবই কড়া। অনেকেই পাপ করেই চলে, তবুও কিন্তু নিজেদের স্বভাব বদলায় না। এই ভাবেই পাপের বৃদ্ধিও হতে থাকে। কিন্তু, এখানে তো বাচ্চারা তোমাদেরকে পুন্য আত্মা হতে হবে। বাবার স্নেহ তো কেবল পুণ্য-আত্মাদের জন্যই। আর পাপ-আত্মাদের প্রতি বাবার বিরোধী মনোভাব। ভক্তি-মার্গের ওরাও কিন্তু জানে যে, সু-কর্মের ভাল ফল। তাই তো তারা দান-পুণ

ইত্যাদি সু-কর্ম করে থাকে। যদিও এ সবই হয়, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, তবুও তো বলা হয়ে থাকে, সু-কর্ম করলে, ভগবান তার ভাল ফল অবশ্যই দেন। সেক্ষেত্রে বাবা জানান, তবে কি আমি এতেই ব্যস্ত থাকবো, যে বসে বসে কেবল এই সবই করতে থাকবো ? এ সব কিছুই তো ঘটে অবিনাশী চিত্রনাট্যে যা খোঁদিত আছে সেই অনুসারেই। আবার নাটকের নির্দ্দিষ্ট সময় অনুযায়ী স্বয়ং বাবাকেও আসতে হয় এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে। বাবা জানান ওনার কাজ হলো - উনি এসে সবাইকে সঠিক দিশা দেখানো। কিন্তু তারজন্য কৃপা করা বা অন্য কিছুর কোনও ব্যাপারই নেই। তবুও কেউ কেউ লেখে - বাবা আপনার কৃপা পেলে, কোনও দিনই আপনাকে ভুলবো না। তাতে বাবা জানান - উনি কখনও কৃপা-টিপা করেন না। এসব তো কেবল ভক্তি-মার্গের ব্যাপার। তোমার প্রতি কৃপা কেবল তুমি নিজেই করতে পারো। তবে হ্যাঁ, বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতি জ্ঞান-মার্গে চলে না। জ্ঞান-মার্গের মূল কথাই হল জ্ঞানের পঠন-পাঠন। টিচারও কি কাউকে থোড়াই কৃপা কৃপা করতে পারেন! প্রত্যেককেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়তে হয়। বাবা যে শ্রীমত দেন, তার হিসেবেই তো চলা উচিত। কিন্তু নিজের মত অনুসারে চলার কারনে, তার ফলে কোনও সেবাই হয় না তাতে। বাচ্চাদেরকে একেবারেই পুণ্য-আত্মা হতে হবে। সামান্যতমও পাপ করা চলবে না। কোনও কোনও বাচ্চারা নিজের পাপকে লুকিয়ে রাখে। বাবা বলেন, তারা কখনই উচ্চপদ পায় না। তা তো কখন-ই আছে "চড়ে তো চাখে বৈকুন্ঠ রস্ - গিরে তো চাকনাচুর"(উন্নতির শিখরে উঠলে হবে বৈকুন্ঠ-রস পান, পড়লে অধঃমুখে পতিতে হবে স্থান") যেহেতু বাচ্চারা জানে যে, এই জ্ঞান কত উচ্চ-স্তরের। পতন হলে তো সে আর কোনও কাজেরই রইলো না। অশুদ্ধ অহংকার হল যার প্রথম কারণ। তার সাথে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহও কোনো অংশে কম নয় । লোভ, মোহ-মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। যেমন বাচ্চার প্রতি মোহ থাকলে তার দিকেই মন চলে যায়। আত্মা কিন্তু বলে-- আমার তো কেবল এক শিববাবার, দ্বিতীয় কারও স্থান-ই নেই মনে, যার কথা স্মরণে আসবে--এইভাবেই পুরুষার্থ করতে হবে। দুনিয়াদারীর সবকিছুই তো বিনাশ হয়ে যাবে। মহা-বিনাশ যে এখন দোড়-গোড়ায়। তখন তো আর আশীর্ব্বাদী বর্সা পাওয়া যাবে না। তাই এসবের প্রতিও মোহ রাখাটা বেকার। এই ধরনের ভাবনা- চিন্তা নিজেরেই নিজের মনে করা উচিত। তাই বর্তমানের জগৎটাকে বুদ্ধি থেকে সরিয়ে রাখা উচিত। এসব ভুলে যাওয়াই ভালো। যেহেতু এ সবই তো শেষ হয়ে যাবে। এমন জোরেই ঝড়-তুফান আসবে, যার ফলে সবকিছুই একসাথে শেষ হয়ে যাবে। যেখানে আগুন লাগে, সেখানে খুব হাওয়া চললে, মূহুর্তেই একেবারে সব কিছুই জ্বলে-পুড়ে ছাঁই হয়ে যায়। আধ ঘন্টার মধ্যেই ১০০ থেকে ১৫০ কুঁড়েঘরকে ছাঁই করে ফেলে। তোমরা তো জেনেই গেছো, ঘূর্ণাবর্তের মতন আগুন চারদিকেই জ্বলতেই থাকবে, তা না হলে, এত সব মানুষ মরবেই বা কীভাবে । যারা সুশীল বাচ্চা, চাল-চলন, হাব-ভাবের লক্ষণ(চরিত্র) ভালো, তারা খুব ভাল সেবাও করতে পারে। বাচ্চারা তোমাদেরও এতে আসক্তি থাকা দরকার। পুরোপুরি আসক্তি তো তখনই আসবে, যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় আসবে তবুও পুরুষার্থ তো করতেই থাকবে। বেনারসে শিবের মন্দিরে তো অনেক ভক্তই যায়, যেহেতু শিবই হলেন উচ্চ থেকে অতি উচ্চের সর্ব্বোচ্চ ভগবান। সেখানে খুব ভক্তিও করা হয় শিবের। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, সেখানে গিয়ে সবাইকে এ সব বোঝাও। এই শিব ভগবানই লক্ষ্মী-নারায়ণকে আশীর্ব্বাদী বর্সা দিয়ে থাকেন। কেবলমাত্র কল্পের সঙ্গম কালেই শিববাবার এই বর্সা ওনার থেকে পাওয়া যায়। এটা বোঝানো হলে, তারপরেই ব্রহ্মা-সরস্বতীর ব্যাপারটাও বোঝানোর প্রশ্ন আসে। চিত্রের সাহায্যে খুব স্পষ্ট ভাবেই তা বোঝানো যায়। এনারা এইভাবে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, আর তা কিসের কল্যানে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকালে ভক্তি-মার্গ বলে কিছু থাকে না। অথচ জাগতিক প্রবাদ আছে যে, ভক্তি

চলে আসছে, সেই অনাদি কাল থেকে। সে সব বিষয়ে, এখন তো তোমাদের অনেক জ্ঞানই প্রাপ্তি হয়েছে। সেক্ষেত্রে তো তোমাদের যথেষ্টই আসক্তি আসা উচিত। যেহেতু তোমাদেরকে এই পাঠ পড়াচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। আগামী ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্য বানাবার লক্ষ্যে। তোমরা এখন ছাত্র স্বরূপে। তাই তো তোমাদের নিশ্চয়তা থাকা উচিত এই যে ব্রহ্মা-কুমারীরা, যাদের থেকে তা শুনে আমাদের নিশ্চয়তা আসে, তারা নিজেরা তবে কি হতে যাচ্ছে। এই বাবার কাছে তো এক্ষুনি যাওয়া উচিত। যতক্ষণ না পুরোপুরি নিশ্চয়তা আসে, ততক্ষণ এগিয়ে যাওয়া যায় না। যার যত নিশ্চয়তা আসে, সে তত দ্রুত গতিতে এগোতে থাকে। তখনই মনে হয়, বাবার সাথে আমি এক্ষুণি দেখা করবো, ওনাকে কোনও ক্রমেই ছাড়বো না। ব্যাস্, বাবা আমি তো আপনারই সন্তান হয়ে গেছি, আর অন্য কোথাও যাবোই না। এরকম একটা গীতও আছে যে, তুমি আমাকে নিজের করো বা দূর করে দাও, এই খ্যাপা কিন্তু তোমার দুয়ার ছাড়ছে না। যাই হোক্ তাকে তো আর ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না। সেবার নিমিত্তে পাঠাতেই হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন থাকা উচিত। যদিও তারা সে সব প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখেও দেয়, কিন্তু বাইরে বেরোলেই মায়ার চক্করে পড়ে যায়। মায়া যে খুবই প্রবল। এই মায়ার কারণেই এত সব বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। ছোট একটা প্রদীপের শিখায় মায়ার কতই না ঝড়-তুফান লাগে। সেই গীতের সারও তো বাবা এসেই ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান সময়টা তোমাদের জন্য পুরুষোত্তম্ সঙ্গম যুগ। ভক্তি-মার্গের ভক্তদের পুরুষোত্তম্ মাস পার হয়ে গেছে। তাই বাবা জানাচ্ছেন, কল্পের এই সঙ্গম যুগেই কেবল উনি আসেন- পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাবার লক্ষ্যে। কত সুন্দর ভাবে তা বুঝিয়েও দেন। আচ্ছা! দিনদিন সেবাকার্যে বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিত্য নতুন যুক্তিও বের হতে থাকবে। সুন্দর সুন্দর চিত্রও তৈরী হতে থাকবে। ঐ যে কথায় আছে না, দেরী হবার পিছনে মঙ্গল লুকিয়ে থাকে। কিন্তু যা হয় - তা ভালই হয়। এখন তো একেবারে তৈরী করা জিনিষ-পত্রই পাওয়া যায়। যা ফট্ করে যে কেউ-ই অনায়াসেই বুঝে যায়। সিঁড়ির চিত্রটাও খুব সুন্দর। বর্তমান সময়ে এমন কেউ-ই নেই যে বলিষ্ঠ ভাবে বলতে পারে যে 'আমরা পবিত্র'। পবিত্র দুনিয়া তো সত্যযুগকে বলা হয়। সেই পবিত্র দুনিয়ার অধীশ্বর হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।

আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো রকম বড় বা সূক্ষ্ম পাপও না হয়, সেদিকে অনেক অনেক লক্ষ্য রাখতে হবে। লুকিয়ে কোনো জিনিস নেবে না। লোভ আর মোহ থেকে সাবধান হয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

২) অশুদ্ধ অহংকার, যা সর্বনাশ করে থাকে, তাকে অবশ্যই ত্যাগ করবে। এক ও একমাত্র বাবাকে ছাড়া, দ্বিতীয় কেউই যেন স্মরণে না আসে-- এই পুরুষার্থ-ই করতে হবে।

বরদান :-- স্মরণের সার্চলাইটের (জ্যোতিদীপ্ত আলোক-রশ্মি) দ্বারা বায়ুমন্ডলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন বিজয়ী রত্ন হও (ভব)!

সেবাধারী আত্মাদের কপালে বিজয়-তিলক লাগানোই থাকে। কিন্তু যে স্থানে সেবাকার্য করতে হবে, সেই স্থানে তার আগে থেকেই সার্চলাইটের জ্যোতি-কিরণ ফেলতে হবে। স্মরণের সেই সার্চলাইট দ্বারা বায়ুমন্ডল যেন এমনই প্রভাবিত হয়, যার ফলে অনেক আত্মারা নিজেরাই সহজেই কাছে চলে আসে। ফলে কম সময়ে হাজার গুণ সফলতা পাওয়া যায়। এই রকম হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প করো-- আমিই সেই বিজয়ী রত্ন, যার প্রত্যেক কর্মেই বিজয় নিশ্চিত হয়ে আছে।

স্লোগান :-- যে সেবায় নিজেকে বা অন্যকে অসুবিধায় ফেলে, তা সেবা না হয়ে বোঝা হয়ে যায়।